স্যার, আমি কি করব! আমি নিতে চাইছিলাম, ওনারা দেন নাই। বলে কি - তুই যদি ঘরে নিস তাহলে আগুন দিয়ে পুড়ে ফেলব।যার বিছানা তারে নিতে দে। এইমাত্র গেল ওনারা। ঘরের সব চাউল বেইচ্চা দিছে। সিগারেট আছিলনা। আমারে বাকি আনতে কইছিল। আমি না করায় হাবিব স্যারে চাউলের বস্তা নিয়া বেইচ্চা সিগারেট কিনেছে।

তাদের ব্যাপারটা বুঝতে চেস্টা করলাম। আমি ওদেরকে বলেছিলাম অফিসের কাজে এমনভাবে আটকে গেছি কাজ সারতে অনেক রাত হয়ে যায়।

মিন্টু জিজ্ঞেস করেছিল, কত দিন লাগবে ঝামেলা সারতে?

আরও কিছুদিন লাগবে।

সেই কিছুদিনের জায়গায় চার মাস হয়ে গেল। আমার ঝামেলা কমছেনা।বরং বাড়ছে। আমি যেন চুম্বকের আকর্ষনে প্রতিদিন চলে যাই শ্যামলীর সাথে। বন্ধুদের কথা আমার মনেই থাকেনা। খাট বিছানা ওরা যেভাবে ওলটপালট করেছে তেমনি শ্যামলী আমাকে - আমার আমিকে ওলটপালট করে দিচ্ছে।

সেদিন মনে হল আমার হৃদয়ের গভীরে যে রানু বসে আছে তাকে শ্যামলী এসে নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছে। চোখের সামনে থেকে ধীরে ধীরে শ্যামলী হৃদয়ে প্রবেশ করছে। এক যুগ যে চোখের আড়ালে আছে তাকে হারিয়ে দেয়া সহজ। রানুর স্মৃতি রোমন্থন করে যে পুলক অনুভব করতাম তা যেন হারিয়ে যাচ্ছে। আরও যদি দেরী করি তাহলে রানু নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। শ্যামলীকে না বলে হঠাৎ কলকাতা যাবার প্রস্তুতি নিলাম।

-পঁচিশ-

কলকাতায় পৌঁছানোর কাহিনী বলে পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাব না। শেষ পর্যন্ত টানা রিক্সায় মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর গ্রামে যখন পৌঁছলাম তখন বেলা দুটো। মনে মনে ভাবছি যার জন্য যাচ্ছি সে আছে কি নেই কে জানে! যদি না থাকে সারদাবাবু তো থাকবেন, না হয় কাকিমা। কাকিমা তো সেই ঘটনা ভুলতে পারবেন না, কাজেই আমাকেও ভুলবেননা। রিক্সা থেকে নেমে একজনকে সারদাবাবুর বাড়ীর কথা জিজ্ঞাসা করলাম। সে চিনেনা বলে জানাল। নাকি চিনেও না চিনার ভান করল বুঝতে পারিনি। তারপর একটা ছেলেকে জিজ্ঞেস করায় সে বলল, রানুদিদের বাড়ী? তারপর বাড়ী দেখিয়ে দিল।

যাবার আগে সাজগোজের কোন কার্পণ্য করিনি। আগাগোড়া পুরো সাহেবি পোষাক। কারণ এতদিন পর আমার শিক্ষকের (নাকি আর কারও) সাথে দেখা করতে যাব। পোষাকের বাহাদুরির যেন কোথায়ও খুঁত না থাকে। সারদাবাবুর ঘরের সামনে গিয়ে নিজকে যেন বেমানান মনে হল। মনে হল এ পোষাক পরে আসা ভুল হয়েছে। উপায় থাকলে তখনই বদলে ফেলতাম।

একটা দুচালা টিনের ঘর। তরজার বেড়া। সামনে একটু বারান্দা। রাস্তা থেকে ঘরে যাবার দু পাশে ময়লা কাদা ভর্তি। মাছি ভন ভন করছে। বাংলাদেশে সারদাবাবুর বাড়ীর কথা মনে হল। সে বাড়ীর কি শান সৌকত ছিল, এখনও আছে। কিন্তু মালিক বদল হয়েছে। আগেকার দিনের জমিদার বাড়ীর সাথে তুলনা করা চলে। আর এই এখানে এত ছোট

ঘরে থাকেন তিনি। তাঁর গোয়াল ঘরটাও এর চেয়ে অনেক বড় ছিল।

ঘরের সামনে গিয়ে ডাকলাম, স্যার বাসায় আছেন? একজন মহিলা ভেতর থেকে জবাব দিলেন, কে ?

আমি ফজলুল হক, বাংলাদেশ থেকে এসেছি। স্যার আছেন?

সারদা বাবুর স্ত্রী আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষন। বললেন, সেই তুমি না? কি যেন নাম, হ্যা ফজলু? আস আস। ঠিকানা কোথায় পেলে? কিভাবে আসলে এখানে? তিনি আমাকে বারান্দায় একটা চেয়ার দিয়ে ভেতরে গেলেন।

আমি মনে মনে বললাম, কাকিমা তাহলে আমার সেই কুকর্মের কথা ভোলেননি।

একটু পর সারদা বাবুকে হাত ধরে নিয়ে এলেন । আমার পাশে আর একটা চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে বললেন, চোখে দেখেন না।

ওস্তাদের সামনে চেয়ারে বসার শিক্ষা তখনও পাইনি। তাই উঠে দাঁড়ালাম। কাকিমা বললেন, বস, তুমি উঠছ কেন। প্রায় জোর করে বসিয়ে দিলেন। তারপর আমার অন্য পাশে আর একটা চেয়ার নিয়ে তিনিও বসলেন।

সারদা বাবু তাঁর হাতটা আমার মাথায় বুলিয়ে হাতের পেশী দেখলেন, পিঠের মাংশ দেখলেন। ঘাড়ে হাতটা রেখে বললেন, তাহলে তুমি আগের সেই তালপাতার সিপাই নেই। স্বাস্থ্য ভাল হয়েছে দেখে খুব খুশি হলাম। তারপর শুরু করলেন জিজ্ঞাসা। তিনি প্রশ্ন করছেন, আর আমি উত্তর দিচ্ছি। প্রশ্নের শেষ নেই। যেন হারানো সন্তান ফিরে পেয়েছেন। বহুদিনের জমা খবর জেনে নিচ্ছেন। প্রথমেই স্কুলের খবর জিজ্ঞেস করলেন। বললাম, আপনার স্থান দখল করেছে আপনার ছাত্র মতিলাল বণিক। তারপর নিজের বাড়ী থেকে গোসাইস্থলের মন্দিরের খবর, পরিচিত সব মানুষের খবর, তাঁর বাড়ীর গাছপালার খবর পর্যন্ত নিলেন। প্রতিটি প্রশ্ন হাসিমুখে, দরদ দিয়ে, কোমল স্বরে, ধীরে ধীরে করছেন। একটু থামছেন। বোধ হয় মনের গভীরে চিরতরে আঁকা হয়ে আছে যা, তা একবার দেখে নিচ্ছেন। কাকিমা বহুদূরে দৃষ্টি রেখে তাকিয়ে আছেন। বোধ হয় তিনি জেগে নেই। আমি উত্তর দিচ্ছি আর তাঁদের মনের অবস্থা লক্ষ্য করছি। একজনের সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করতে গেলে মানুষ যে এত খুশী হয় তা আমার ধারনা ছিলনা।

প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি আর ঘরের দরজার দিকে তাকাচ্ছি। আর কেউ এসে প্রশ্ন করে না কেন ? আমি কি শুধু সারদা বাবুর সাথেই দেখা করতে এসেছি! আছে কি নেই তাও জানি না। রানু কোথায় জিজ্ঞেস করব কিনা ভাবছি। শুরুতেই যদি জিজ্ঞেস করি তাহলে আমার এক যুগের গোপন জপমালার কথা ফাঁস হয়ে যেতে পারে। তাই অন্য কথা পাড়লাম। জিজ্ঞেস করলাম, আপনার এতবড় বাড়ীর বিনিময়ে আপনারা এই একটা দুচালা টিনের ঘর পেলেন? এর চেয়েতো আপনার গোয়াল ঘরও বড় ছিল।

এতক্ষন তাঁর মুখে একটা উজ্জ্বল হাসি উদ্ভাসিত ছিল। আমার প্রশ্নটার সাথে সাথেই মুখটা কালো হয়ে গেল।

না, না! বাড়ীতো অনেক বড়ই পেয়েছিলাম। আমাদের বাড়ীর চেয়ে কম নয়। ঐতো, কয়েকটা বাড়ী পর দেখবে একটা বড় বাড়ী। সেটা বিক্রি করে দিয়েছি। এটা কিনেছি বছর দুয়েক হল।

বিক্রি করে দিলেন কেন?

সে বহু কাহিনী। প্রথমতঃ আমার চোখের চিকিৎসা। এখানে আসার দু বছর পর থেকেই চোখ নষ্ট হয়ে গেল। হাজার হাজার টাকা খরচ করলাম। এখনও দেখতে পাইনা।

বিষ্ণুদা কোথায়? দেখলাম তাঁর মুখটা আরও কালো হয়ে গেল।

বললেন, ছেলেমেয়ে নিয়ে কলকাতায় থাকে।

রানুকে কোথায় বিয়ে দিলেন ?

না, রানুর বিয়ে হয়নি । বলে তিনি চুপ করে গেলেন।

আপনার বড় মেয়ে ছায়া কোথায় ? তার বর তো কুমিল্লা কলেজে অধ্যাপক ছিলেন। তারা কি এখনও সেখানে আছে?

না বাবা, সবই আমরা ভুল করেছি। একটার পর একটা। ছায়াও চলে এসেছে। তার জামাই এখন কেরানীর কাজ করে। এখানে এসে কোন কিছুই পাইনি। না সামাজিক, না অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠা। সামাজিক ভাবে আমরা তো এখানকার মানুষের সাথে মিশতেই পারিনা। এখানকার কৈবর্তরাও আমাদের মনে করে নীচ জাতের। পূর্ববঙ্গ থেকে যারা এসেছে তারা সবাই নাকি রায় চৌধুরী। কামার কুমোর সবাই। আসল রায় চৌধুরীও তাদের কাছে কামার কুমোর। তাই বিয়ে শাদির জন্যও খুঁজতে হয় পূর্ববঙ্গের পাত্র পাত্রী। সেখানেও আবার জাতের বিচার হয়। জাতে জাতে না মিললে বিয়ে হয়না। এ কারনেই রানুর বিয়ে আজও হয়নি।

তাহলে আপনারা আসলেন কেন ?

একটা কঠিন প্রশ্ন করলে। কেন আসলাম ! আজ বুঝতে পেরেছি আমাদের মানসিক রোগে পেয়েছিল। একটা মোহ। যেন পরশ পাথরের মোহ। নাহয় কোন কারনই ছিলনা। পাকিস্তানে মাঝে মাঝে রায়ট হত। সেটা ছিল শুধুই শহরে। শহরের বাইরে, গ্রামের দিকে কোনদিন কোন ঘটনা ঘটেনি। তবু কেন জানি মানসিকভাবে আমরা খুব দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম। তাই সামান্য কিছুতেই মনে হত এটা মুসলমানের দেশ। আর এখানে এসে যেসব অবস্থার মুখোমুখি হচ্ছি তার কোন বর্ণনা করা যাবেনা। তার চেয়ে পূর্ববাংলায় অনেক ভাল ছিলাম। যে ভুল করেছি তা আর শুধরাবার নয়।

আপনার চলছে কি করে? বিষ্ণুদা কি টাকা পয়সা দেয়?

না, বিষ্ণু যা বেতন পায় তা নিজেরই চলেনা। আমাকে দেবে কোথা থেকে। আমাকে চালায় রানু। সে একটা স্কুলে মাস্টারি করে এখান থেকে দশ মাইল দূরে। সকাল সাতটায় যায় আর ফেরে পাঁচটা/ছটায়। তার কস্ট দেখলে আর কিছুই সহ্য হয়না।

অনেকক্ষন কেউ কোন কথা বললাম না। আমি ফিরে গেলাম বার বছর আগে সারদা বাবুর স্মৃতিতে। কি দামি ফিন ফিনে ধূতি পাঞ্জাবী পরতেন তিনি। রানু প্রতিদিন নতুন নতুন পোষাক পরে আসত স্কুলে। মনে হত জমিদারললনা। তাদের সবকিছুতেই ছিল একটা আভিজাত্যের ছাপ। আজ এখানে একটা স্যাঁতস্যাঁতে টিনের ঘরে দীনতার মাঝে অন্ধ হয়ে পড়ে আছেন। অসহায় জীবন নিয়ে, অতীত রোমন্থন করে শেষ দিন গুনছেন। অথচ বাংলাদেশে তাঁর যে সম্পত্তি ছিল, তাতে কোন কাজ না করলেও রাজার হালে দিন চলে যেত।

হঠাৎ সারদাবাবু বললেন, তোমার বাবা আর আমি ছোটবেলার বন্ধু, এক সাথে স্কুলে পড়েছি। তাকেও বলে আসা সম্ভব হয়নি। একবারে চোরের মত পালিয়ে এসেছি। আমি জানতাম, যদি তোমরা কেউ জানতে পারতে তাহলে আমাকে আসতে দিতেনা। আর আমিও আসতে পারতাম না। কিসের টানে যে সবকিছু এমনভাবে পায়ে দলে চলে এলাম আজ ভাবলে অবাক লাগে। তাই ইচ্ছে হয় একবার সেই জন্মস্থানটা ঘুরে আসি, সকলের সাথে একবার দেখা করি। কিন্তু অন্ধ মানুষ, গিয়ে কি হবে! কিছুই তো দেখতে পাবনা!

এমন সময় এক মহিলা বারান্দার সামনে এসেই থমকে দাঁড়াল। আমার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। হয়ত বা চেনা চেনা। আমিও তাকিয়ে রইলাম। এক যুগের প্রতীক্ষার দৃষ্টি দিয়ে। এই মুখ দেখব বলে একটা যুগ আমি দিন গুনেছি। কত দিন, কত বিনিদ্র রাত কল্পনা করে কাটিয়েছি! স্বপ্ন দেখেছি কত! সেই মানুষ এখন আমার সামনে দাঁড়িয়ে! কি করব, এই মুহূর্তে কি করা যায়! কি বলব! কি দিয়ে শুরু করব কথা? কোন্ কথা? আমার চোখ কি ভিজে যাচ্ছে! কোথায় সে রানু! সে যে হারিয়ে গেছে। তার সেই লাবণ্য কোথায়? সেই তারুণ্যের চঞ্চলতা, যৌবনরঙ্গের কোমলতার সামান্য লেশমাত্রও নেই। এ মুখ কোন এক মহিলার মুখ। একটা রুক্ষতায় আবৃত। এ মুখ রানুর মুখ নয়। ঘামে তার মুখ চিক চিক করছে। পরনে একটা সাদাসিধে শাড়ি। হাতে একটা ব্যাগ। সে এক পা এগোতেই কাকী বললেন, দেখ্ কে এসেছে।

আমি রানুর পোষাকের দিকে তাকিয়ে রইলাম। কি ছিল তার পোষাকের বাহাদুরি। প্রতিটা পোষাকের আলাদা গন্ধ ছিল। কোনদিন থাকত আতরের গন্ধ, কোনটায় নেপথলিনের গন্ধ, কোনদিন গন্ধরাজ। এখন তার পরনে যে শাড়ী তা একবারেই সাদাসিধে যাতে মধ্যবিত্তের একটা ছোঁয়া লেগে আছে। দেখলেই বোঝা যায় সে মধ্যবিত্তের সমাজটাকে আঁকড়ে ধরে আছে কোনমতে।

রানুর চেহারা দেখে মনে হল খুশিতে, তুপ্তিতে হঠাৎ একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ বয়ে গেছে তার সমস্ত অঙ্গে। কয়েক মুহূর্ত স্থির থেকে নিজকে সামলে নিয়ে আমার দিকে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। বারান্দায় উঠে এসে একটু হেসে বলল, কে, ফজলু? কেমন আছ? আমার যে বিশ্বাস হচ্ছেনা। সত্যিই তোমাকে দেখছি তো?

যাক, তাহলে ভোলেনি। চিনতে পেরেছে। শরীরের যা অবস্থা! চেনার কথা নয়। এ অবস্থায় যখন চিনেছে তাহলে তারও মাঝে মাঝে মনে পড়ত হয়ত। জিজ্ঞেস করলাম, কেমন আছ ? বহুদিন থেকে একবার স্যারকে দেখতে আসব ভাবছিলাম। এবার একটা সুযোগ পেয়ে গেলাম।

রানু বলল, কেমন আছি তা দেখেই বুঝতে পারছ। তুমি এসেছ আমার যেন বিশ্বাস হচ্ছেনা। নিজকে বিশ্বাস করতে পারছিনা। কারন কেউ তো আজ পর্যন্ত বাবাকে দেখতে আসেনি। তাও আবার বাংলাদেশ থেকে। তোমাকে কি দিয়ে আথিতেয়তা করব? মা, কি দিয়েছ খেতে?

ওর আনা মিস্টি, ফল দিয়েছি। অনেক কিছু এনেছে। তিন ঝাঁকি ফল, দু পাঁতিল মিস্টি। বাংলাদেশের মানুষের নজরই আলাদা। সে মুসলমানই হোক আর হিন্দুই হোক।

রানু ভিতরে গেল। কাপড় ছেড়ে হাতমুখ ধুয়ে একটু পরেই ফিরে এল বিস্কুট আর চা নিয়ে। কাকি বললেন, তোমরা কথা বল। আমি রান্নাঘরে গেলাম। কাকির চেয়ারটায়, আমার একবারে পাশে রানু বসল।

রানুরও হাজার প্রশ্ন। সারদা বাবুর মত একই প্রশ্ন ফিরে ফিরে বার বার করছে। স্কুলের খবর, গ্রামের তার বান্ধবীদের খবর, গোসাইস্থলের মেলার খবর, তাদের বাড়ীটা কি অবস্থা সব কিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করছে। সারদাবাবু মাঝে মাঝে যখন যেটা মনে আসছে জিজ্ঞেস করছেন। আমি দুজনের প্রশ্নেরই উত্তর দিচ্ছি। একসময় রানু জিজ্ঞেস করল, সেই দীঘির পাড়ে বড়ই গাছটা এখনও আছে? প্রায়ই আমার মনে পড়ে সেই গাছটার কথা। স্কুলশেষে তুমি গাছে উঠতে, আর বুড়িটা গালাগালি করতে করতে দৌড়ে আসত। যেই আমি বলতাম, দাদি আমি বলেছি পাড়তে। বেশি পাড়বেনা। তখন বুড়ি চুপ করে যেত। বুড়িটা আমাকে খুব ভালবাসত।

আমি বললাম, কি জানি আছে কি নেই। তোমরা আসার পর ওপথে আর যাইনি। সেটাতো আমার বাড়ী ফেরার পথ ছিলনা।

আমার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ থেমে গেল রানু। তারপর আবার শুরু করল, পয়লা বৈশাখ এলেই আমার গোসাইস্থলের মেলার কথা মনে পরে। অনেক স্মৃতি এসে মনের কোণে ভীড় করে। হারিয়ে যাই সেখানে। ছয় মাস আগে থেকেই দিন গুনতাম আর কতদিন বাকী। তারপর একদিন এসে যেত, আবার পরের বছরের জন্য অপেক্ষা করতাম। এখনও কি আগের মতই মেলা জমে? পুকুর পাড় ছাড়িয়ে একবারে ক্ষেতের আলে পর্যন্ত চলে যায়? এখনও কি তেমনি লুটের বাতাসা নিয়ে হুড়োহুড়ি হয়?

আমি অনেক বছর মেলায় যাইনা। আগের মত আনন্দ পাইনা। মেলার কথা মনে হলেই মনটা খারাপ হয়ে যায়। তাই মেলার দিন আমি অন্য কোথাও চলে যাই।

রানু বেশ কিছুক্ষন আনমনা হয়ে চুপ করে রইল। তারপর জিজ্ঞেস করল, তুমি এখন কি কর? পড়াশুনা কতদূর পর্যন্ত করেছ? নিশ্চয়ই অংক আর পড়নি?

আমার অংকের কথা তোমার মনে আছে ?

মনে থাকবে না ! বাবা বলতেন, অন্যান্য বিষয়ে তোমার জন্য কোন ভাবনা ছিলনা। শুধু অংকটার জন্যই পিছিয়ে ছিলে। তাই এত শাস্তি দিতেন। এখন তোমার অংকের খবর কি ?

সেই যে মেট্রিক পাশ করলাম তিরিশ পেয়ে তারপর আর কাছে যাইনি। কলা বিভাগে ভর্তি হয়ে ল পাশ করেছি। এখন একটা চাকরি করছি।

কেন, ওকালতি কর । চাকরির প্রয়োজন কি?

এক উকিলের সাথে কাজ করতে গিয়েছিলাম। আমার মনে হল ওতে মানুষের উপকারের চেয়ে অপকার বেশি হয়। যেন জোর করে টাকা আদায় করা। তাই ওটা আমার দ্বারা হলনা। দেশ স্বাধীন হয়েছে। এখন আমার একটা ভাল চাকরি হয়েছে। ফিরে গিয়েই যোগ দেব। চাকরিতে যোগ দেবার আগেই স্যারকে দেখতে এলাম। চাকরিতে যোগ দিয়ে ফেললে আর আসা হবেনা। এবার বল, তুমি কি পাশ করেছ? শূনলাম তুমি মাস্টারি কর।

দাদা যতদিন টাকাপয়সা দিতেন ততদিন লেখাপড়া করেছি। তারপর নিজেই সংসারের জোয়ালটা কাঁধে নিয়েছি। বাঁচতে তো হবে। আমার বি এ পাশ হয়নি। দেখলাম, সারদাবাবু বহুদূরে দৃষ্টি রেখে হারিয়ে গেছেন কোন্ অতলে। একবারে নিশ্চল, নিথর।

এসময় আমিও রানুর দিকে অনেকক্ষন তাকিয়ে নিথর হয়ে গেলাম। আমার ছেলেবেলার রানুকে খুঁজলাম, তার গায়ের গন্ধ খুঁজলাম। তার গায়ে অনেক রকমের গন্ধ ছিল। চুলের একটা সুবাস ছিল। তার গায়ের গন্ধ ছিল খুব মিষ্টি - না মিষ্টি নয়, চুম্বকের মত, না ঠিক তাও নয়। অবশ করার মত - কামিনী ফুলের গন্ধ যা নাকের কাছে নিলে যার আশ মেটেনা। আরও নিতে ইচ্ছে হয়। সেই ধরনের গন্ধ। যা আজও আমার নাক থেকে মুছে যায়নি। তার পাশে যখন বসতাম তখন বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন গন্ধ পেতাম।

রানু বলতে লাগল, এই মাস্টারি পেতেও অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। ওপার বাংলার মানুষ হলেই আলাদা ব্যবহার। তোমার যোগ্যতা থাকলেও চাকরি পাবেনা। কারন আমাদের তো মন্ত্রী বা উপরওয়ালা নেই যে সুপারিশ করবে। আর শুপারিশ না করলে এখানে চাকরি পাওয়া যায়না। একটা চাকরির জন্য হাজার সুপারিশ। যার যত শক্ত সুপারিশ তার তত তাড়াতাড়ি চাকরি হয়। তারপর আবার ফিরে গেল স্কুলের কথায়। ছেলেবেলার ছোট্ট তুচ্ছ ঘটনা, যা মনে রাখার মত নয়, সেগুলোই আজ তার কাছে গল্প হয়ে গেছে। বার বার ফিরে ফিরে সেগুলোই শুনতে চায়। আমি যখন বলতে থাকি মনে হয় রানু চোখ দিয়ে দেখছে। মাঝে মাঝে আনমনা হয়ে চুপ করে থাকে, আবার শুরু করে।

-ছাব্বিশ-

রানু বলল, চল খাবে। সেই কখন এসেছ। তোমার জন্য এমন বিশেষ কিছুই করিনি। আর করার সামর্থ্যও নেই। বাবা যখন মাস্টারি করতেন তখন তাঁর বেতন আমরা খরচ করে শেষ করতে পারতাম না। এ দেশে এসেই দেখি জিনিষের দাম আগুন। কোন কিছুতেই হাত দেয় যায়না। তখন আমরা ওপারের জীবনের কথা ভাবতাম। জিনিষের দামের তুলনা করতাম। কত সস্তা ছিল সেখানে সব জিনিষ! আর আমি যা বেতন পাই তা দিয়ে তিনজনের মাস চলেনা। শুধু টিকে থাকা। চল, বাবা, তুমিও উঠ। এক সাথে খাবে।

আমি ভাবছি কোথায় উঠতে বলে। ঘর তো একটাই। দেখলাম সে ঘরেই একটা ছোট টেবিলে খাবার ব্যবস্থা করেছে। দরজায় দাঁড়িয়ে ভাবছি ভেতরে যাব কি যাবনা। এমন সময় রানু বলল, দাঁড়িয়ে রইলে কেন। আস, ভেতরে আস। না, ভেতরে আসলে আমরা খাবার ফেলে দেব না। মনে আছে সেই কথা?

মনে আছে বলেই তো ভাবছি। আবার কিসে কি হয়ে যায়! সেই যে একদিন তোমার পেছন পেছন তোমাদের ঘরে ঢুকে পড়েছিলাম। আর কি কান্ড! একটা হৈচৈ। তোমাদের ঘরের রান্না করা খাবার সব ফেলে দিলে। আমি লজ্জায় অনেক দিন তোমাদের বাড়ীতে যাইনি। পূজার সময় গিয়ে সেই লজ্জাটা গেল। তখন তো কিছুই বুঝতামনা।

কাকিমা বললেন, তোমার চেহারাটা আমার এজন্যই এখনও মনে আছে। যখন আমি বললাম তুমি ঘরে ঢুকে পরেছ? কি সর্বনাশ! এ কি করলে! তখন তুমি এক দৌঁড়ে বেরিয়ে গেলে। সেদিন আমাদের অনেক অতিথি ছিল। পুকুরের অনেক বড় রুই মাছ রান্না হয়েছিল। ফেলতে মনে যে কি কস্ট হয়েছিল তা কি বলব। তাই ঝামেলাটা বেশি হয়েছিল।

রানু বলল, এখন বুঝলেও কোন অসুবিধা নেই। কারন ওসব শুধু বাংলাদেশেই ছিল। এখানে নেই। বাংলাদেশে এসব আছে বলেই আমরা মুসলমানদের সাথে থাকতে পারিনি। আমরাই নিজেদের আলাদা করে রেখেছিলাম। তুমি হিন্দু না মুসলমান, তোমার গায়ে লেখা নেই । তুমি বাংঙালি, বাংলায় কথা বল এটাই বড় কথা। তোমার ধর্ম মসজিদে, আমার ধর্ম মন্দিরে। তার বাইরে আমরা বাঙালি। এই দেখনা আমরা ব্রাম্মন বলে শুধু মুসলমানদের ছোঁয়ার বাইরেই থাকিনা, নীচ জাতের হিন্দুদের ছোঁয়ার বাইরেও থাকি। ছেলেবেলার কিছু কথা মনে হলে আজ হাসি পায়। মনে আছে তোমার? পয়লা বৈশাখে গোসাইস্থলের মেলা থেকে সুন্দর একটা প্লাস্টিকের বাঁটের ছুরি কিনেছিলে তুমি? যেটা সব সময় তোমার কোমড়ে এমনভাবে বেধে রাখতে যেন সকলের চোখে পড়ে। সেটা দিয়ে স্কুলের গাছের আম কেটে দিতে, দোকান থেকে আনা লবন দিয়ে কি মজা করে খেতাম। তখন তোমার হাতের ছোঁয়ার কোন অপরাধ ছিলনা। যেই জল ছুঁয়ে দিতে অমনি সব গেল। সব ছোঁয়া যাবে, শুধু জল ছোয়া যাবেনা। স্কুলের টিউবওয়েলের জল খেতে গিয়ে প্রতিদিন কি কান্ড হত! এসব কারনে আমরা আলাদাই রয়ে গেলাম। এপার ওপার, দুপারেই।

বাংলাদেশেও এখন আর এসব নেই। হিন্দুর বাড়ীতে মুসলমান, মুসলমানের বাড়ীতে হিন্দু অহরহ খাওয়াদাওয়া করছে। কোন বাছবিচার নেই। এসব উঠে গেছে।

এগুলো অনেক আগেই ওঠা উচিত ছিল। তাহলে হয়ত আমরা ওখানেই থেকে যেতাম। মানসিকভাবে আমাদের অনেক পরিবর্তন আসত।

আমরা তিনজন খেতে বসলাম। কাকিমা পাতে দিয়ে দিচ্ছেন। মনে হল যেন আমার কোন নিকট আত্নীয় বাড়ী। সর্বদা আমার আসা যাওয়া আছে। সামান্য আয়োজন। আলু ভর্তা, করলা ভাজি, ডালের চচ্চরি। মনে হল যেন শাহী খাবার। দরদ দিয়ে রান্না করে স্নেহের রঙিন চামচ দিয়ে পরিবেশন করেছেন কাকিমা। পরিবেশনেই সামান্য জিনিষ অসামান্য হয়ে উঠে। সে অসামান্য, খোলা হৃদয়ের অতিথিসেবা, যেখানে দৈন্য ঢাকার কোন চেস্টাই ছিলনা, চিরদিন মনে থাকবে। খাওয়াদাওয়ার পর আবার গল্প চলল। একই কথা বার বার বলি। তাদের কাছে মনে হয় নতুন। এক সময় বললাম, এবার আসি।

রানু কিছুতেই আসতে দেবে না। আমারও 'মন যেতে নাহি চায়'। মনে হল আজ রাতটা যদি থেকে যাই তাহলে রানুকে আরও ছোট করা হবে। তাদের দৈন্য আরও প্রকাশ হবে। তাদের ক্লাবে আমার থাকার ব্যবস্থা করবে বলায় আমি বুঝিয়ে দিলাম যে, আমার হোটেলে ফিরে যাওয়া খুব জরুরী। তখন রানু বলল, তুমি তো এখন এখানে রিক্সা পাবেনা। একটু বস। আমি ব্যবস্থা করছি। বলে বেরিয়ে গেল। একটু পরেই ফিরে এসে বলল, এখান থেকে একটু দূরে একটা রিক্সা স্টেন্ড আছে। তুমি এতটুকু হেঁটে যেতে পারবেনা। তাই পাশের বাড়ীর ছেলেটাকে পাঠালাম। এখনি নিয়ে আসবে।

আমার মনে হল কি একটা কাজ বাকী রয়ে গেছে। মনে মনে নিজেকে অপরাধী মনে হল। বার বছর প্রতীক্ষার পর

যাকে এক নজর দেখতে এলাম তার জন্য কিছুই আনিনি। পরমুহূর্তেই নিজকে মুক্ত করে নিলাম। আমি তো জানতাম না রানু এখনও অবিবাহিতা। ভাবলাম তার হাতে কিছু টাকা দিয়ে যাই ভাল দেখে একটা কাপড় কিনবে। আবার ভাবলাম এটা ভাল দেখায় না। এর মাঝেই রিক্সা এসে গেছে বলে একটা ছেলে এসে বলল। দেখলাম সেই ছেলেটা যে রানুদের বাড়ী চিনিয়ে দিয়েছিল। বোঝা গেল রানুর খুব ভক্ত। তিন চারটা বাড়ী পরে রাস্তায় দাড়িয়ে আছে রিক্সা।

সারদাবাবু আর কাকিমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রওয়ানা দিলাম। রানু বলল, চল তোমাকে রিক্সা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি।

রানুদের ঘর থেকে রাস্তা পর্যন্ত গলিটা এত সরু দুজনে পাশাপাশি হাঁটা যায়না। তাই রানু পেছনে, আমি আগে হাঁটছি। চলতে চলতে কথা বলছি। একসময় বললাম, জান রানু কাকে দেখতে এসেছি?

তুমি ত বললে বাবাকে দেখতে এসেছ! বলেই ফিক করে হেসে ফেলল। তারপর বলল, জানি। এবং আমার ধারনা ছিল অনেক আগেই আসবে। পাঁচ ছ বছর চলে যাবার পর আমার ধারনাটা বদলে গেল। আজ মনে হল আমার ধারনাই ঠিক।

এভাবে না বলে কয়ে হঠাৎ নীরবে চলে এসেছিলে কেন? একবার বলে আসলে কি হত?

আমিই কি ছাই জানতাম নাকি যে আমরা চিরতরে আমাদের সবকিছু ছেড়ে চলে যাচ্ছি! সন্ধ্যার সময় মা বললেন, আজ আমরা হিন্দুস্থানে যাচ্ছি। এবং চিরতরে। তখন আমার কি কান্না! আমি যে তখন কি করব, কোথায় যাব স্থির করতে পারিনি। বাবা মাকে বললাম, না গেলে হয় না? বললেন, সব ঠিক হয়ে গেছে। যেতেই হবে। একবার ভেবেছিলাম পালিয়ে যাই। কিন্তু কোথায় যাব। কে আমাকে আশ্রয় দিত? আর কিভাবেই বা দিত? তুমি দিলে তো পরের দিনই সমস্ত দেশ রটে যেত যে হিন্দু মেয়েকে মুসলমান ছেলে জোর করে নিয়ে গেছে ইত্যাদি ইত্যাদি! তখন তো কেলেঙ্কারির শেষ থাকত না! সেই সময় যদি কেউ আমাকে আশ্রয় দিত তাহলে আমি আসতাম না। নিজের জন্মভুমি ছেড়ে অজানা দেশে আসতে আমার একদম মন চায়নি। তাই আজও এই দেশটাকে আমার নিজের দেশ মনে হয়না। যখন তখন আমার মানসপটে ভেসে ওঠে সেই স্কুলের পথ, তেতুঁল তলা, দিঘী, বাড়ীর সামনে বকুলতলা। আমি আনমনা হয়ে যাই। নিজকে হারিয়ে ফেলি। মনে হয় আমার দেশ ছেড়ে পরদেশে বাধ্য হয়ে বাস করছি। জানিনা কবে এই দেশটাকে আমার নিজের দেশ ভাবতে পারব।

একযুগ পার করে দিলে এই দেশে, এখনও বল কবে নিজের দেশ ভাবতে পারবে জাননা। এক জায়গায় এতদিন থাকলে নিজের অজান্তেই সব আপন হয়ে যায়, নিজের হয়ে যায়। দেখবে এ দেশ ছেড়ে অন্য কোথায়ও যেতে পারবেনা। তখন মন আবার এই জায়গার জন্যই কাঁদবে।

না, মন কাঁদবেনা। কারণ এখানে কোন কিছুর সাথেই আমার মিল হয়নি। এই বার বছরে একটিও বন্ধু জোটেনি যার সাথে মনের কথা বলা যায়। যেখানে বন্ধু নেই সে জায়গার জন্য কোন পিছুটান থাকেনা।

কেন, এত বছরে একটিও বন্ধু জোটাতে পারনি?

কি করে হবে? আমাদের কথার মাঝে পূর্ববাংলার একটা টান আছে। যত চেষ্টাই করিনা কেন, জন্মগত টানটা এসে যায়। আর তখনি এখানকার মানুষ বুঝে ফেলে ওপার বাংলার। ওপার বাংলা মানে অন্য জাতের। তাই হৃদয় খুলে দিয়ে আর এগিয়ে আসেনা। একটা অজানা অদৃশ্য পর্দা এসে অজান্তেই আলাদা করে দেয়। তাই এত বছরেও কোন বন্ধু হয়ে ওঠেনি।

তুমি বিয়ে করছনা কেন?

সে কথা তো ভাবতেই পারিনা ফজলু! তুমি কি মনে কর খুঁজলে পাত্র পাওয়া যায়না? নিশ্চয়ই যায়। বাবাও তেমন ভাবে দেখছেন না আর আমিও এ ব্যাপারে চিন্তা করিনা। বাবার কথা মনে হলে ওসব চিন্তা কোথায় চলে যায়! বাবার তো আর কেউ নেই। আমিই একমাত্র সম্বল। দাদা এক পয়সাও দেয় না। দেবেওনা কোনদিন। তার বউ খুব দজ্জাল মেয়ে। দেখনা দাদার কথা উঠলেই বাবা আনমনা হয়ে যান। আর আমার কথা উঠলে বিষাদে তাঁর মুখটা কালো হয়ে যায়? তিনি মনে মনে নিজকে অপরাধী ভাবেন। বাবার দিকে তাকিয়েই জীবনটা কাটিয়ে দিব ভাবছি। এই আমার জীবন।

আমরা রিক্সার কাছে এসে পড়লাম। রিক্সা টেক্সি পর্যন্ত পৌঁছে দিবে। তারপর আমি হারিয়ে যাব। হয়ত আর কোনদিন দেখা হবেনা। আমার এক যুগের লালিত বাসনা প্রকাশ করব কিনা ভেবে রানুর দিকে তাকিয়ে আছি। মনে হল আমি ঘেমে যাচ্ছি। সাহস করে আমার হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে কাঁপা কাঁপা স্বরে বললাম, আমার হাতটা একবার দেখবেনা বেতের দাগ আছে কিনা? রানু যেন ঠিক এই মুহূর্তটিরই অপেক্ষায় ছিল। অবলীলায় আমার হাতটা তার হাতে টেনে নিয়ে দুহাতে চেপে ধরল। আমার হাতের দিকে না তাকিয়ে মুখের দিকে তাকিয়ে রইল অপলক। বেতের দাগগুলো বোধ হয় মুখে এসে গেছে। তাই রানু হাতের দিকে না তাকিয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। আমার সমস্ত অঙ্গ বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত শিহরিত হয়ে পুলকে আবেগে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। আমার ইচ্ছে হল অনন্তকাল দাঁড়িয়ে থাকি। হাতে হাত রেখে, এমনি করে, এইখানে। সব চাওয়া পাওয়া, বিশ্বের সমস্ত সুখ যেন পুঞ্জিভুত হয়ে আছে ওই দুহাতের মাঝখানে। আমার হাত অবশ। রানুর হাত কাঁপছে। এক যুগের লালিত মনের বহু না-বলা কথা, অনেক অসম্ভব কল্পনা, অলীক বাসনা মুহূর্তে আদান প্রদান হয়ে গেল দুজনের শিরায় শিরায়। দুজন দুজনকে স্পর্শের ভেতর দিয়ে অন্তরের গভীরে প্রবেশ করে একবার দেখে নিলাম। দূরে রাস্তার একটা আলো এসে রানুর মুখে পড়ছে। তার চোখগুলো চিক চিক করে উঠল। অশ্রু কিনা বোঝা গেলনা। আবছা আলোআঁধারে আমি তার বিষাদক্লিষ্ট মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম। মনে হল তার ইচ্ছে হয় বলে, 'যেতে আমি দিবনা তোমায়', কিন্তু সামর্থ্য নেই। কর্তব্যের কাছে হেরে যাচ্ছে তার সব আহ্লাদ।

এক সময়, আমার সমস্ত অঙ্গ অবশ হবার আগেই, সেই হাতের মাঝখান থেকে আমার হাতটা জোর করে ছাড়িয়ে নিয়ে মাতালের মত রিক্সায় উঠলাম। আমার চোখের পাতা বোধহয় ভিজে গেছে। কয়েক ফোটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল কিনা খেয়াল করিনি। আমার ঠোঁট কাঁপছে। বিদায়ক্ষনে কেউ কোন কথা বলতে পারলাম না। কি জিনিষ গোপন করতে গিয়ে দুজনেই মূক হয়ে গেলাম। ভাষাহীন এ বিদায় যেন এক যুগের সঞ্চিত বেদনা প্রকাশ করে দিল। অনেকদূর এসে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম রানু দাড়িয়ে হাত নাড়ছে। তার বিষাদেভরা ক্লান্ত মুখখানা আমার চোখের সামনে ভাসছে। এক যুগের সাধনার পর ওই ক্লান্ত মুখের ছবিখানাই এঁকে নিয়ে গেলাম আমার মানসপটে, ভবিষ্যতের পাথেয় করে।

ট্যাক্সিতে বসে আকাশ পাতাল অনেক ভাবলাম। একবার ইচ্ছে হল ট্যাক্সিকে বলি ফিরে চল। সারাটা জীবন কাটিয়ে

দেব রানুর পাশে পাশে থেকে। তার সব কাজের পাশে আমি থাকব। আর কিছু নয়, শুধুই দেখব। দেখে দেখেই কাটিয়ে দিব সারাটা জীবন। আবার মনে হল আমাকে ফিরে যেতে হবে। আমার জন্য ভুখা মিছিল অপেক্ষা করছে। যাদের কথা দিয়েছিলাম স্বাধীনতার স্বাদ পৌঁছে দেব। প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে হবে। আবার ভাবলাম দুদিকেই তাল রাখতে পারি কিনা। কোন সিদ্বান্তেই পৌঁছতে পারলাম না।

কি দিয়ে আমি তাকে কি সাহায্য করতে পারি! আমার মন বিষিয়ে গেল। ইচ্ছে হল আর একবার অস্ত্র হাতে নেই। এবার পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে নয়। ঐ তাদের বিরুদ্ধে, যারা মানুষকে হিন্দু আর মুসলমান বলে আলাদা করেছে, যারা ধর্মের নামে বিষ ছড়িয়ে একটা জাতিকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে!

-সাতাইশ-

পাঁচদিন কলকাতায় পাগলের মত ঘুরে বেড়ালাম। দর্শনীয় বহু জায়গায় গেলাম। কিছুই ভাল লাগেনা। প্লেনেটেরিয়ামে গেলাম। দেখলাম সমস্ত আকাশে রানু ছেয়ে আছে। কোন গ্রহনক্ষত্র আমার চোখে পড়েনি। যেদিকে তাকাই সেদিকেই রানু।

বোটানিকেল গার্ডেনে গেলাম। সারাদিন সেখানে ঘুরে বেড়ালাম। ঐতিহাসিক গার্ডেন। যেখানে পৃথিবীর সবচেয়ে পুরাতন গাছ, অনেক অমূল্য বৃক্ষ যা পৃথিবীর আর কোথায়ও নেই সেসব গাছের নাম আমার মনে নেই। কারন গাইড কি বলছিল তা আমার কানে পৌঁছেনি। আমার মন পড়ে ছিল রানুর কাছে। মাথায় ছিল রানুর চিন্তা। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় অশথ্ব গাছটার নীচে দাঁড়িয়ে আমি অবাক হয়ে গেলাম। এত বড় তার পরিধি! এত ডাল পালা! অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি। মনে হল গাছের ডালায় ডালায় পাতায় পাতায় রানুর অস্তিত্ব মিশে আছে।

রাতে হোটেলে ফিরে আসি। মনে শুধু রানুর বাঁশি বাজে। একবার ভাবি, কি হবে ফিরে গিয়ে। এখানেই থেকে যাই। ফিরে যাই রানুর কাছে। আবার পিছুটান আমাকে নিয়ে যায় মায়ের কাছে। আমি কোন সিদ্বান্তে পৌছতে পারিনা। গড়ের মাঠ, রবীন্দ্রসদন, মিউজিয়াম সব ঘুরে বেড়ালাম। না, আমি আমার নিজকে ফিরে পাইনি। সেদিন রাতে ঘুম আসেনি। সারা রাত জেগে জেগে সিদ্ধান্তে পৌছে গেলাম।

পরদিন হোটেল থেকে চেক আউট করে একটা বাজ্জাজের ট্যাক্সিতে উঠে বললাম, মুর্শিদাবাদ, জঙ্গিপুর চল।

ট্যাক্সি চলল। আমি আবার ভাবনার অতলে ডুবে গেলাম। আমি ফিরে যাব রানুর কাছে! কি বলব ফিরে গিয়ে? সারদাবাবু কি ভাববেন! কাকিমা কি বলবেন? আবার ফিরে যাব কাকে দেখতে? সারদাবাবুর সাথে তো দেখা হয়ে গেল। রানুকে কি বলব? বলব, আমি বাকী জীবন তোমার পাশে থাকব? কি হিসেবে? কেন থাকব? কোন্ অধিকারে? হৃদয়ের টান তো মানুষের জীবনে কত দিক থেকেই আসে, তাই বলে কি সকলে সব কিছুর টানে সাড়া দিতে পেরেছে? আমাদের সমাজ, এপারেই হোক আর ওপারেই হোক, আজও ধর্মীয় নীতিতে অটল। তাই আমি গিয়ে বুক ফুলিয়ে বলতে পারবনা, 'রানু, চল ঘর বাঁধি।' আজ আবার ফিরে যাওয়া মানে আমার এক যুগের লালিত গোপন অনুভুতি সকলের কাছে প্রকাশ হয়ে যাওয়া। এ অর্থহীন। যা অসম্ভব তার পেছনে ছুটে নিজকে ছোট করা শুধু। তার চেয়ে এ অনুভূতি সীমাবদ্ধ থাক দুজনের মাঝেই। পৃথিবীর আর কেউ জানবেনা। শুধু আমি আর রানু। দুজন দুজনকে ভেবে পুলক অনুভব করব এই ভাল। ড্রাইভারকে বললাম, ফিরে চল নিউ মার্কেট ট্র্যাভেল এজেন্সিতে।

তাকিয়ে দেখি তখনও ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে চৌরঙ্গির মোড়ে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি এক ঘন্টা কেটে গেছে। সামনে মহানগরির মহা যানজট। পৃথিবীর বিখ্যাত যানজটের শহর কলকাতা। টান রিক্সা, ঠেলা গাড়ি, গরুর গাড়ি, ট্রাক, বাস, টেক্সি, টেম্পু, গাড়ী সবকিছুই চায় আগে যাবে। তাই আগে যেতে গিয়েই জটের সৃষ্টি হয়। এক জায়গায় জট লেগে গেলে সমস্ত শহর আটকে যায়। অবশ্য এখন আমার তাড়া নেই। এক সময় গিয়ে নিউ মার্কেটে পৌছলেই হল।

-আটাশ-

অবশেষে ফিরে এলাম বাসাবোর 'ছাত্রনীড়'এ। আমার মনে হল আমার কিছুই নেই। আর কোন কাজ নেই, কাজের প্রয়োজন নেই। অফিসে যোগ দিলাম না। চুপচাপ ঘরে পড়ে রইলাম। মনে হল চাকরিটার প্রয়োজন ছিল শুধু কলকাতায় যাবার জন্যই। যাওয়া হয়েছে। চাকরির প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। বন্ধুরা খবর পেয়ে ছুটে এল। আমার চেহারা দেখে তারা আঁৎকে উঠল। একি হয়েছে তোর চেহারা! কোথায় গিয়েছিলি? আমরা কি তোর কোন সাহায্যই করতে পারিনা? বল্, তোর কি লাগবে! আমরা সবকিছু করতে প্রস্তুত।

বললাম, তোরা কোন কাজেই লাগবিনা। এটা এপার ওপারের ব্যাপার। এখানে সাহায্যের কিছু নেই।

এপার ওপার মানে?

সে অনেক সমস্যা রে! এপারের সমস্যা ওপারে। ওপারের সমস্যা এপারে। তোরা বুঝবিনা। কত লক্ষ মানুষ ওপারে তার সবকিছু ফেলে এপারে এসেছে, আর এপার থেকে কত লক্ষ ওপারে গেছে তার হিসেব কেউ রাখেনি। তাদের শত সহস্র সমস্যা। সে সব সমস্যার সমাধান কেউ করতে পারবেনা। সমস্যা তৈরী করা সোজা, সুরাহা করা বড়ই দুরুহ। শুরু হয়েছিল একটা বাক্য দিয়ে। 'এটা মুসলমানের দেশ, ওটা হিন্দুদের দেশ।' সেই থেকেই শুরু। কত লক্ষ মানুষ তাদের পূর্বপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে, নিঃস্ব হয়ে, রক্তাক্ত পথ বেয়ে, এপার থেকে ওপারে অথবা ওপার থেকে এপারে এসেছে। তাদের সাথে আর কিছু যায়নি। গিয়েছে তাদের দুঃখগাথা অগনিত কাহিনী আর অবর্ণনীয় সমস্যা। কেউ কোনদিন সেসব সমস্যার সমাধান করতে পারবেনা। আমিও না, তোরাও না, কেউ না।

তুই তো আর ওপার থেকে আসিসনি। তোর আবার সমস্যা কি? মিন্টু বলল।

আমি আসিনি। কিন্তু যারা ওপারে চলে গেছে তাদের কেউ একজন আমার সবকিছু নিয়ে গেছে। তারই কিছু ফিরে পেতে গিয়ে আরও সমস্যা নিয়ে ফিরে এলাম।

অ, তোমাকে তাহলে সেই রোগে ধরছে। ভাগিয়ে নিয়ে আসলেই পারিস।

ভাগিয়ে আনার চেয়ে ভেগে যাওয়া বোধহয় লাভজনক। কিন্তু তাও হবার নয়।

এ আবার কেমন কথা? ভাগতেও পারবিনা, ভাগাতেও পারবিনা! তাহলে তোর প্রবলেম তুইই সুরাহা কর। নাহয় তোকে হসপিটালে নিতে হবে। দেখলে তো মনে হয় একটা গুন্ডা। তোর আবার প্রেমের মন আছে নাকি? কই,

এতদিনে একবারও তো শুনিনি এমন কোন নাম, যার জন্য তোর চেহারার এমন ছুরুত হবে! তুই সব ছেড়ে দিয়ে বসবি!

না, কেউ জানেনা! শুধু সে জানে আর আমি জানি। পৃথিবীর আর কাউকে বলিনি। বলে কি হবে! শুধু একবার করুণার চোখে আমার দিকে তাকাবে। আর কিছু ভাববে না। আমার মত আরও কত সহস্র মন এমনি ধুঁকে ধুঁকে শেষ হবে সে কথা কেউ বুঝতে চেষ্টা করবেনা।

ইদ্রিস বলল, ওসব ভাবলে আমরা তো দেশটাকে আলাদা করতাম না। নেতার সংখ্যা বেশি হয়ে গিয়েছিল। আলাদা হওয়াতে দু দেশে অনেক নেতার সংস্থান হয়েছে। কে কোথায় কি হারাল, কত মরল তা দিয়ে নেতাদের কিছু যায় আসেনা। তাদের গদি থাকলেই হল। ওসব নিয়ে এখন চিন্তা করে মাথাটা খারাপ করে লাভ নেই। বাদ দে ওসব কথা।

সাতদিন পর মায়ের চিঠি পেলাম। কিছু টাকার প্রয়োজন। টাকা পাঠাতে হবে। তাহলে কাজে যোগ দিতে হবে। অফিসে গেলাম। সবাই আমার দিকে তাকিয়ে রইল। কেউ কেউ এগিয়ে এল। লালু বলল, কিরে, তোর আবার অসুখ হয় নাকি? এইবার তোর চেহারা দেখলে মনে হবে ছয় মাইস্যা বেরাইম্যা। তোর হইছে কি? দুই সপ্তাহে চেহারাখান এমন করলি কেমনে? অনেকেই এসে আমাকে ঘিরে দাঁড়াল। অনেকের অনেক প্রশ্ন।

মজিবর বলল, তোর খোঁজে এক পরী এসেছিল। গত এক সপ্তাহে তিন দিন।

আমার বুঝতে অসুবিধা হয়নি কে এসেছিল। কিন্তু এত জরুরী কেন? এক সপ্তাহে তিন দিন কেন? কোন বিপদ হল? কাশেম তো আর কোন ঝামেলা করতে পারবেনা! তাহলে? কারওর অসুখ? নাকি অন্য কোন বিপদ? কি হতে পারে?

কে এসেছিল? পরী? কেন এসেছিল জিজ্ঞেস করিসনি?

নামও তো জিজ্ঞেস করিনি ভয়ে। তবে পরী নামে যে জিনিষের কথা আমরা বলি, যা কোনদিন চোখে দেখিনি, এই সেই পরী। পরী বোধ হয় তার চেয়ে সুন্দরী নয়। চোখের দিকে তাকানো যায়না। প্রথম দিন এসে জিজ্ঞেস করেছিল, কবে আসবি। আমরা তো কিছুই জানিনা। তাই বলেছিলাম, বোধ হয় অসুখ হয়েছে। কিছুক্ষন দাঁড়িয়ে থেকে চলে গেল। ভাবটা দেখে মনে হল বোধ হয় আরও কিছু জিজ্ঞাসার ছিল। শেষ দিন মানে পরশু এসে তোর বাসার ঠিকানা জানতে চেয়েছিল। আমি বলে দিয়েছি, বাসায় নেই। কাজেই ঠিকানা নেয়া বৃথা। ব্যাপারটা কি? পরী তোরে খোঁজে কেন? এমন সময় বড় সাহেবের পিয়ন এসে খরব দিল বড় সাহেব আমাকে ডাকছেন।

বড় সাহেব আমাকে ডাকেন না। দরকার হলে তিনি নিজেই আসেন। স্বাধীনতার পর এই সমীহটুকু পেয়েছি সকলের কাছ থেকে। আমার একটা আলাদা স্থান আছে সবাইর কাছে। তাছাড়া খুব শীঘ্রই চলে যাচ্ছি অন্যত্র। হঠাৎ এই খবরে আমি একটু বিরক্ত হলাম। অনিচ্ছাসত্বে তাঁর কামরায় গেলাম।

আরে! আপনার এ অবস্থা কেন? কি হয়েছে? শরীর খুব খারাপ মনে হয়! অফিসে আসলেন কেন? একটা খবর দিলেই তো পারতেন! তিনি একবারে দাঁড়িয়ে গেলেন।

বললাম, না শরীর তেমন খারাপ নয়। এখন ভাল আছি।

আমাকে বসতে বলে চৌধুরি সাহেব নিজে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে আবার ফিরে এসে বসলেন। বললেন, দেখুন বছরের ছয় মাসও যায়নি। আপনার সব রকমের ছুটি শেষ। গত দু সপ্তাহ অফিসে আসেননি। সেগুলো যে কিভাবে কি করব তার জন্যই আপনাকে ডেকেছি। সকলের সামনে তো এসব আলাপ করা যায়না। একটাই পথ আছে সই করে দেয়া। আমি যেন জানিনা, এমন ভাবেই করতে হবে। একবারে সব সই করবেননা। দুএকদিন পর পর দুটো চারটে করে এই দু সপ্তাহের ঘরগুলো পূর্ন করে দেবেন। আর শরীরের যত্ন নিন। দরকার হলে আরও কয়েকদিন বিশ্রাম নিন। আমি ব্যবস্থা করে দেব। ডাক্তার সাহেবকে বলে দেব। মেডিকেলে লিভে চলে যান। আপনার জন্য আরও কিছু করতে পারলে আমি খুশি হব।

না, এখন লাগবেনা। যখন লাগবে তখন আপনাকে বলব। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। বলে বেরিয়ে এলাম।

বের হয়েই দরজার দিকে শ্যামলির চোখে চোখ পড়ে গেল। আমার বিশ্বাস হচ্ছেনা। মনে হল আমি স্বপ্ন দেখছি। আসলে আমার মাথাটা বোধ হয় ঠিক নেই। কলকাতায় দেখেছি শুধু রানু, আর এখানে শ্যামলি। আসলেই আমাকে হাসপাতালে যেতে হবে। আমি তাকিয়েই আছি শ্যামলির দিকে। আমি যেন শ্যামলিকে চিনতে পারছিনা। কোন কথা বলছিনা, শুধু তাকিয়ে আছি। যেন স্বপ্নে আমি কথা বলতে গিয়েও বলতে পারছিনা। মুখে কথা আসছেনা। মনে হল বাস্তবেই শ্যামলী পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে। একবারে কাছে, ঠিক আমার বুকের কাছে দাঁড়িয়ে, তার মুখটা আমার মুখের কাছে এনে, একবারে ঠোঁটে ঠোঁট ছুঁয়ে যায় অবস্থায় দাঁড়িয়ে, শ্যামলি বলল, একী হয়েছে চেহারা! এতবড় অসুখ হল একবার খবরও দিলেন না! আর আমরা এদিকে কত কি ভাবছি! চলুন আমার সাথে। বলে আমার হাত ধরে টানতে লাগল। গ্রামের বাড়ীর সবাই জানে শ্যামলি দজ্জাল, নির্লজ্জ, মুখে মুখে কথা বলে। পুরুষের সাথে ঝগড়া করে। কিন্তু তাই বলে এত লোকের সামনে একজন পরপুরুষের হাত ধরে টানাটানি করবে এ কথা কেউ ভাবতে পারেনি। আমি কি বলতে যাচ্ছিলাম। আমাকে ধমকের সুরে থামিয়ে দিয়ে বলল, একটাও কথা বলবেননা! তাহলে আমি চিৎকার করব!

শ্যামলীকে দেখলে আমার দেহে শিহরন জাগে। তার কথায় ঝর্নার কলতান, শ্বাসপ্রশ্বাসে কিসের জাদু। তার দেহে কি এক সুবাস বাতাসে বাতাসে আবেশ ছড়ায়। চুলের গন্ধে মাতাল করে দেহমন। কিসের একটা অজানা দুর্বার আকর্ষন, যা আমাকে চুম্বকের মত কাছে টানে। এই কয়দিন শ্যামলীর কথা একবারও মনে হয়নি। আমি যেন অন্য জগতে ছিলাম। যেখানে শ্যামলীর কোন অস্তিত্ব ছিলনা। রানুর না-বলা অনেক কথা, রানুর স্মৃতি আমার দেহমনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। কোন এক কাল্পনিক জগতে বিচরন করে বুভুক্ষ মনের বৃথা সান্ত্বনার খোঁজে রত ছিলাম। শ্যামলীর হাতের পরশে আমার সেই আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল। শিরায় শিরায় একটা ঝংকার বেজে উঠল। শ্যামলী আমার সামনে, সশরীরে, বাস্তবে। রানু বহুদূরে, হৃদয়ের অনুভূতি আর কল্পনায় মিশে আছে। মনে হল এই কয়দিনে আমি দেহে মনে অনেক দুর্বল আর অসহায় হয়ে পড়েছি। কল্পনার জগত থেকে বাস্তবে ফিরে আসতে হবে আমাকে।

অফিসের সকলের সামনে দিয়ে, শ্যামলী আমার হাত ধরে নিয়ে চলেছে। আমি কোন কথা বলতে পারছিনা। মুখ দিয়ে কোন কথা আসছেনা। মনে হল রানু আমার হাতটা চেপে ধরে আছে। তার বিষাদক্লিষ্ট মুখখানা দেখতে চেষ্টা করছি। দেখা যাচ্ছেনা। সেদিনের না-বলা কথা, একযুগের সঞ্চিত মনের বাসনা যেন কোন এক নিভৃতে গিয়ে, হৃদয়ের দ্বার খুলে প্রকাশ করবে। শোনাবে এপার ওপারের বহু অজানা কাহিনী। তার কোলে মাথা রেখে আমি সব শুনব। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, অনন্তকাল ধরে। আমি চলেছি তার হাতে হাত রেখে। কোন্ পারে নিয়ে

যাবে জানিনা।

-সমাপ্ত-

সীমান্ত সংবাদ
প্রাপ্তিস্থান: মাওলা ব্রাদার্স
বাংলাবাজার,ঢাকা